চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশল [4gw], ৯/১১ ও আল-ক্বা’ইদাহর রণকৌশল

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিজাহুল্লাহ

৯/১১ এর বরকতময় হামলার উদ্দেশ্য কি ছিল? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র প্রতীকী (symbolic) বিজয় অর্জনের জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র অ্যামেরিকাকে বিশ্বের সামএন অপমানিত করার জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধুমাত্র ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ? শুধুমাত্র যুগের হুবালকে আঘাত করার খাতিরে করা একটি আঘাত? এ হামলার উদ্দেশ্য কি ছিল মিডিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি?

৯/১১ এর প্রচলিত ব্যাখ্যা হিসেবে উপরের এ ধারনাগুলোই অধিক প্রচলিত। এ বরকতময় হামলার আবেগের দিকটি নিয়ে, অ্যামেরিকাকে অপমানিত হতে দেখার তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও, এ আক্রমণে শার'ঈ বৈধতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হলেও – এ হামলার সামরিক ও কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা তুলনামূলকভাবে অনেক কম, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়।

অথচ ৯/১১ এর হামলা হল এমন এক ঘটনা যা আধুনিক সময়ে কুফফারের বিরুদ্ধে উম্মাহর সজ্ঘাতের পটভূমি সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে। ৯/১১ আগের পৃথিবী আর ৯/১১ এর পরের পৃথিবী এক না। এক প্রাজন্মিক যুদ্ধের প্রথম, ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখা আঘাত হল ৯/১১। খেলার নিয়ম পাল্টে দেওয়া, দান উলটে দেওয়া এক চাল হল ৯/১১।

৯/১১ এর কৌশলগত ও সামরিক গুরুত্ব, এবং যে চিন্তাধারা থেকে ৯/১১ উৎসারিত তা সঠিক ভাবে জানা, বোঝা এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এটা একদিকে যেমন আমাদেরকে সাহায্য করবে অতীতকে বুঝতে ও আমাদের বর্তমানকে বিশ্লেষণে, তেমনিভাবে এটা আমাদের সাহায্য করবে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের চিন্তাকে। নিচের লেখাটিতে উত্থাপিত কিছু বিষয় ও আকাঙ্ক্ষার বর্তমানে এ ভূমির পরিস্থিতির সাথে মিলে যাওয়াও চিন্তাশীল পাঠকের চোখ এড়ানোর কথা না।

প্রবন্ধটি তানযিম ক্বা'ইদাহতুল জিহাদের আরবী ম্যাগাযিন "আল-আনসার"-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ "চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশল" [Fourth-Generation Wars] থেকে অনূদিত। প্রবন্ধটির লেখক আবু-'উবাইদা আল-ক্বুরাইশি –

"...যেভাবে পরাজিত মানসিকতা বর্তমানে উম্মাহর চিন্তার কেন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, পরাজিত মানসিকতার এ ব্যাধিতে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক আক্রান্ত ব্যাক্তিদের অনেকেই হলেন 'আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। এমন একজন আলিম, আম্রিকার আগ্রাসন নিয়ে এক টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, আরব বিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে মুজাহিদিনের সমর্থন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া তিনি আরো কিছু ভুল দাবি উত্থাপন করেছেন।

তার একটি দাবি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। এই 'আলিম বলেন, আম্রিকা ও তার মিত্রদের সামরিক শক্তির সাথে মুজাহিদিনের শক্তির ব্যাপক তারতম্য আছে। শক্তির একটি ভারসম্যহীনতা আছে। আর এ ব্যাপক ভারসাম্যহীনতার কারনে এ মূহুর্তে জিহাদ করে কোন

লাভ নেই, জিহাদ সমর্থন করারও কোন প্রয়োজন নেই কারন এ যুদ্ধের মীমাংসা ইতিমধ্যেই আম্রিকার পক্ষে হয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে এ বক্তব্য থেকে বক্তার অজ্ঞতাই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথমত, ইসলামী শরীয়াহর ব্যাপারে, আর দ্বিতীয়ত, ইতিহাস ও সমসাময়িক পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষণ ও কৌশলের ব্যাপারে। এ প্রবন্ধ বিষয়টি পরিষ্কার করা হবে।

আল-ক্বা'ইদাহর রণকৌশলঃ

১৯৮৯ সালে কয়েকজন প্রথম সারির অ্যামেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেন, ভবিষ্যৎ যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে সামরিক ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে। তাদের ধারণা ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন ধরনের যূদ্ধকৌশলের উদ্ভব ঘটবে এবং পুরনো কৌশলগুলোকে হটিয়ে নতুন ও যুদ্ধকৌশলই যুদ্ধের ময়দান নিয়ন্ত্রন করবে । তারা এর নাম দেন "চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ" [Fourth Generation War], অনেকে একে Assymmetric War [শক্তির ভারসাম্যহীনতার যুদ্ধ] বলে অভিহিত করেন।

সামরিক ইতিহাসবিদদের মত অনুযায়ী ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর সামরিক কৌশল ও যুদ্ধের ধরন তিনটি মূল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম পর্যায় ছিল সারিবদ্ধ ভাবে প্রাথমিক যুগের রাইফেল হাতে বিপুল সংখ্যক সেনা শত্রুর বিপরীতে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের উদাহরণ হল অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল গুলিবর্ষনের মাধ্যমে যথাসম্ভব শত্রুর সেনা ও শত্রুর সম্পদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা।

তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধে আগের পর্যায় গুলোর তুলনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ প্রজন্মের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল ট্যাঙ্ক ও বিমানের দ্বারা বিভিন্ন সামরিক বিন্যাস [formation] ব্যবহারের মাধ্যমে, শত্রুকে ঘিরে ফেলা। দ্বিতীয় প্রজন্মের ট্রেঞ্চ যুদ্ধে বৈশিষ্ট্য ছিল শত্রুকে সামনে থেকে ঘিরে ধরা। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মে এ কৌশল পরিবর্তন করে ফ্রন্ট লাইনের পরিবর্তে পেছন থেকে শত্রুকে ঘিরে ধরার কৌশল গৃহীত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চতুর্থ পর্যায়ের যুদ্ধ একটি নতুন ধরনের যুদ্ধ। এতে যুদ্ধ হবে মূলত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। শুধুমাত্র শত্রুর সামরিক স্থাপনা ও সেনাবাহিনীকে আঘাত করা মধ্যে এ যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং শত্রু দেশ বা জাতির সমাজও ও যুদ্ধের আওতায় পড়বে। এ যুদ্ধের একটি মূল লক্ষ্য হবে শত্রুর সেনাবাহিনীর বা যোদ্ধাদের প্রতি শত্রুর সমাজের যে সমর্থন তা নষ্ট করে দেওয়া। একারনে এ যুদ্ধে দশ-বিশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার একটি ডিভিশানের চাইতে টিভি চ্যানেলগুলোর সংবাদ শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর কার্যকর অস্ত্র হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির মাঝের পার্থক্যগুলো ক্রমশ মুছে একপর্যায়ে

নিলীন হয়ে যাবার অবস্থা হবে। অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থা এবং শান্তিকালীন অবস্থার মাঝে যে পার্থক্য আগের পর্যায়গুলোতে ছিল, সেটা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে মুছে যাবে। এক অর্থে বলা যায় যুদ্ধের চুরান্ত ফায়সালার আগে উভয় পক্ষই অবিরাম যুদ্ধে [Perpetual War] লিপ্ত থাকবে।

আরেক দল সমরবিদ এ বিশ্লেষণের কিছু বিষয়ের সাথে দ্বিমত করলেন। তাদের দাবি ছিল – চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের মূল কৌশলগত ফোকাস হবে শত্রুর মনস্তত্ত্বের উপর, এবং প্রতিপক্ষের সামরিক নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদদের চিন্তাকে প্রভাবিত করার উপর। শুধুমাত্র যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধবিন্যাস না চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকা পালন করবে মিডিয়া, এবং সকল ধরনের ইনফরমেশান নেটওয়ার্ক। এগুলোর উদ্দেশ্য হবে প্রতিপক্ষ দেশ বা জাতির সাধারণ জনগন ও অভিজাতশ্রেণীর চিন্তাকে, জনমতকে প্রভাবিত করা। এদলের বিশেষজ্ঞরা আরো দাবি করলেন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ হবে তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র পর্যায়ের। একটা বিশাল ময়দানে বা কোন সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সামনাসামনি যুদ্ধের বদলে এ যুদ্ধ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হবে ভূতের মতো। যার আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ, আবার হঠাৎ করেই সে মিলিয়ে যাবে। একি সময় একাধিক জায়গায় উদয় হবে আবার তাকে ধাওয়া করতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বহারিয়ে যাবে। এ যুদ্ধের ফোকাস হবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। এ যুদ্ধ হবে সর্বব্যাপী। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশ, গোত্র, আন্তর্জাতিক বাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনও অংশগ্রহণ করতে পারে। এ যুদ্ধের

ধরন, এ যুদ্ধের ধারণা হবে সম্পূর্ণ নতুন। তবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিভিন্ন যুদ্ধ কৌশল চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

১৯৮৯ সালে পশ্চিমা সমরবিদরা এই নতুন ধরনের যুদ্ধের আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তারা এ পুর্বাভাসও করেছিলেন যে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ পশ্চিমা সামরিক শক্তির জন্য বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি করবে। আর তাই এ যুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য পশ্চিমা সামরিক বাহিনীগুলোকেও মৌলিক ভাবে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। দর্শন ও বাস্তবায়ন [Ideology & Operation] উভয় ক্ষেত্রেই।

পশ্চিমা সমরবিদরা শুন্য থেকে এসব পূর্বাভাস করেননি। তাদের এ পূর্বাভাস ও বিশ্লেষণ ছিল বাস্তবতার নিরিখেই। তবে উম্মাহর মাঝে থাকা কাপুরুষরা এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে তাদের আয়ুষ্কাল কাটিয়ে দিতেন চান তাদের কল্পনার জগতেই। বাস্তবতা হল চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে গেছে। এ যুদ্ধকৌশল সফল ভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই এ যুদ্ধে কাগজে-কলমে দুর্বল পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এবং একাধিক ক্ষেত্রে জাতি-রাস্ট্র পরাজিত হয়েছে রাষ্ট্রহীন জাতির কাছে।

উম্মাহর বিজয়ঃ

মুসলিম উম্মাহ ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধানে বশ কিছু উল্লেখযোগ্য সামরিক বিজয় অর্জন করেছে। উসমানি সালতানাতের পর এতো কম সময়ের ব্যবধানে এরকম বিজয়ের ঘটনা আর ঘটে

নি। গত দুই দশকে উম্মাহ সামরিক বিজয় লাভ করেছে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে, সোমালিয়াতে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে, চেচনিয়াতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ লেবাননে যায়নিস্ট ইস্রাইলের বিরুদ্ধে । এ বিজয় গুলো অর্জিত হয়েছিল সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, সর্বোত্তম প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিভিন্ন বাহিনীর বিরুদ্ধে। আর এ বিজয়গুলো অর্জিত হয়েছে, মরুভূমি, পাহাড়, শহর – বিভিন্ন ধরনের স্থানে।

আফগানিস্তানে মুজাহিদিনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে। সোমালিয়াতে একটি গোত্রের কাছে লাঞ্ছিত হয় অ্যামেরিকা, বাধ্য হয় পিছু হটতে। তার কিছুদিন পর শিশানী মুজাহিদিন পরাজিত করে রাশিয়ান ভালুককে। আর তারপর লেবানীজদের কাছে পরাজিত হয়ে যায়নিস্ট ইস্রাইল দক্ষিণ লেবানন থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। [এ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিলে ২০০২-০৩ এর দিকে। বর্তমানে আমরা এখানে যোগ করতে পারি আফগানিস্তানে ও ইরাকে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে বিজয়কে]

একথা সত্য, এসব সামরিক বিজয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী শক্তি শাসনক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয় নি। তবে এটি একটি ভিন্ন আলোচনা, আমাদের এ সামরিক-কৌশলগত বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিক না। এ লেখাতে আমাদের ফোকাস সামরিক সংঘাত এবং অ্যামেরিকা ও মুজাহিদিনের মধ্য সামরিক শক্তির ভারসাম্যহীনতাকে নিয়ে। এ

ভারসাম্যহীনতার অজুহাত দিয়ে যে পরাজিত মানসিকতার ব্যাক্তি আজ জিহাদকে এবং বিজয়কে অসম্ভব বলে দাবি করেন তাদের বিভ্রান্তির জবাব দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য।

উন্নত প্রযুক্তি আফগানিস্তান, সোমালিয়া, শিশানে (বর্তমানে ইরাক, ইয়েমেন ও সিরিয়া) এসব বাহিনীকে বিজয় এনে দিতে পারেনি। যদিও এসব বাহিনীর কাছে পৃথিবীকে কয়েকশো বার ধ্বংস করার মত আণবিক-পারমাণবিক অস্ত্র আছে। শুধুমাত্র হালকা অস্ত্র নিয়ে মুজাহিদিন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন। মুজাহিদিন জনসাধারনের মাঝে থেকে এসে আক্রমন করেছেন, এবং প্রয়োজনে জনগণের মাঝেই মিশে গেছেন। একারনেই অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা মাইকেল ভিকারস মন্তব্য করেছিল – আমাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম-প্রযুক্তি ও যুদ্ধকৌশল এ ধরনের যুদ্ধের (4th Generation Warfare) জন্য উপযুক্ত না।"

এছাড়া মুজাহিদিনের তুলনায় শত্রুর যোদ্ধাদের সংখ্যাধিক্য থাকার পরও আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও শিশানে বিজয় অর্জিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গত শক্তির ও সংখ্যা ব্যাপক তারতম্য থাকা সত্ত্বেও দুই দশকে একাধিকবার একাধিক সুপারপাওয়ার মুজাহিদিনের ক্ষুদ্র দলের কাছে পরাজিত হবার নজীর আছে। সুতরাং যেসব কাপুরুষরা শক্তির তারতম্য অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে জিহাদের দায়িত্ব থেকে পালাতে চায় তাদের কুযুক্তি বাস্তবতার নিরিখে টেকে না। [এ প্রপবন্ধ লেকাহ হয়েছিল ২০০২-০৩ এর দিকে। এ প্রবন্ধ লেখার

পরবর্তী ১৪ বছরে এরকম বিজয়ের আরো অনেক নজীর আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম উম্মাহ প্রত্যক্ষ করেছে]

গাযওয়াতুল ম্যানহাটনঃ

কেউ হয়তো বলতে পারেন, উথ্থাপিত সকল উদাহরণই ছিল আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে একটি জাতির প্রতিরোধের। এ উদাহরণগুলো আল-'ক্বাইদাহর ক্ষেত্রে খাটবে না। কারন আল-ক্বা'ইদাহ নিজস্ব ভূখন্ডের বাইরে গিয়ে শত্রুকে আক্রমন করে।

এ কথার উত্তর হল। প্রথমত, আল-ক্বা'ইদাহ তালিবানের সাথে মিলে যুদ্ধ করে, আর তালিবানরা তাদের নিজস্ব ভূখন্ডেই যুদ্ধ করছে। দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই আল-ক্বা'ইদাহর মুজাহিদিন প্রমান করেছেন যে তারা প্রচলিত আন্তসংঘাতসমূহের নীতি অনুসরন করে তাদের যুদ্ধকৌশল নির্ধারন করেন না।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অ্যামেরিকার অন্যান্য শত্রু রাষ্ট্রগুলো দশকের পর দশক ধরে, অজস্র অর্থ-সম্পদ খরচ যা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি, আল-ক্বা'ইদাহ সীমিত সামর্থ্য নিয়ে তা অর্জন করেছেন। আল-ক্বা'ইদাহ একটিমাত্র আঘাতে নিজ ভূখণ্ড রক্ষার জন্য অ্যামেরিকার ব্যবহৃত কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যূহের [Strategic Defense] সবগুলো স্তরকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। অ্যামেরিকার কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যূহের এ স্তরগুলো হল –

পূর্বাভাস [Early Warning] আক্রমনের পূর্বে প্রতিরোধক আঘাত [Preventive Strike] নিবৃত্তকরনের নীতি [Principal of Deterrance]

পূর্বাভাস [Early Warning]:

৯/১১ এর হামলাগুলো ছিল সামরিক ইতিহাসের সর্বাধিক কার্যকর ও সফল অতর্কিত হামলাগুলোর একটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪১ সালে অ্যামেরিকার পার্ল হারবারের জাপানের হামলা, ৯১৪১ এ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাযি জার্মানীর হামলা, ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক অতর্কিতে চেকোস্লোভাকিয়াতে হামলা, ১৯৭৩ সালে আরব আর্মিগুলোর অতর্কিতে বার-লেভ লাইন অতিক্রম করা –এসবই সফল অতর্কিত হামলার উদাহরণ।

আক্রমনের কার্যকারিতা এবং শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির বিবেচনায় আল-ক্বা'ইদাহর এ হামলা ছিল এধরণের অন্যান্য সকল আক্রমনের তুলনায় সফল। কারন এ আক্রমনের পর আক্ষরিক ভাবেই প্রতিটি অ্যামেরিকান নাগরিকের মনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সকলেই আশংকা করছিল যেকোন সময়ে যেকোন কিছু ঘটে যাবার।একটি দেশের মধ্যে এধরণের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সে দেশের অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বের উপর তা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে অ্যামেরিকার মতো একটি সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরো বেশি, কারন অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধের পর নিজ ভুমিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা তারা প্রত্যক্ষ করে নি।

অ্যামেরিকার বিশাল গোয়েন্দা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের নজরদারী করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ থাকলেও তারা এ আক্রমনকে প্রতিহত করতে ব্যার্থ হয়েছিল। তারা এ আক্রমনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতেও ব্যার্থ হয়েছিল।

বিবেচনা করুন – ইউএসএস কোল একটি যুদ্ধজাহাজ হিসেবে যুদ্ধবস্থার প্রস্তুতি নিয়েই ছিল। তথাপি অ্যামেরিকার ইউএসএস কোলকে আক্রমন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাহলে যেখানে একটি সতর্ক ও যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়া সামরিক টার্গেটকে এধরণের আক্রমনের হাত থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব না, সেখানে কিভাবে একটি সম্পূর্ণ বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে এধরনের আক্রমনের জন্য প্রস্তুত করা বা সতর্ক রাখা সম্ভব? সুতরাং চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার নিরাপত্তা ব্যূহের প্রথম স্তরের কার্যকারিতা অনেকাংশেই কমে যায়। যার প্রমান হল ৯/১১ এর হামলা।

আক্রমনের পূর্বে প্রতিরোধক আঘাত [Preventive Strike]

নিজ ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য অ্যামেরিকার তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যূহের এ স্তরটিও ৯/১১ এর দিন ব্যার্থ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ স্তরটি প্রথম স্তরের উপর নির্ভরশীল। একটি সম্ভাব্য আক্রমন সম্পর্কে সতর্ক হবার পরেই কেবল সে আক্রমন বন্ধে প্রতিরোধক আঘাত করা যায়। যদি আমরা ধরেও নেই যে অ্যামেরিকা কাছে একটি সম্ভাব্য আক্রমনের ব্যাপারে কিছু তথ্য ছিল, তথাপি আল-ক্বা'ইদাহর উপর প্রতিরোধক আক্রমন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন যেহেতু, এটি হল

এমন একটি সংগঠন যা অতি দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে, এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘসময় অবস্থান করে না। সহজ ভাষায় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গেলে নিশ্চিত ভাবে আপনি আল-ক্বাইদাহকে পাবেন। আল-ক্বা’ইদাহ একই সাথে একাধিক জায়গায় থাকতে পারে আবার কোথাও নাও থাকতে পারে। যেমন ৯/১১ এর আক্রমনকারী আক্রমনের আগে কোন নির্দিষ্ট এক জায়গায় একত্রিত হয়ে অবস্থান করছিল না। যদি আ কোন কারনে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ কোন আক্রমনে শায়খ উসামা সহ অন্যান্য নেতারা নিহতও হতেন তবুও অ্যামেরিকার পক্ষে সম্ভব হতো না ৯/১১ এর আক্রমন ঠেকানো।

নিবৃত্তকরনের নীতি [Principal of Deterrance]

নিবৃত্তকরনের এ নীতি গড়ে উঠেছে একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে। ধারনাটি হল – প্রত্যেক যুদ্ধে দুটি পক্ষ থাকে যারা যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন ও স্বার্থরক্ষার জন্য। এ ধারনাটিকে মূলনীতি হিসেবে ধরেই নিবৃত্তকরনের নীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু যদি কোন সজ্ঘাতের এক পক্ষ এমন হয় যে তারা বেঁচে থাকার চাইতে শহীদ হওয়াকে বেশি পছন্দ করে, তখন এ নীতি আর কাজ করে না।

একারনে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধে নিবৃত্তকরনের নীতি অত্যন্ত কার্যকরী। কিন্তু একটি সংগঠন যার স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই, পশ্চিমা কোন ব্যাঙ্কে যার জমা করা কোন পুজি নেই, যে সংগঠন অন্য কোন দেশের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য বা ত্রান পাবার উপর নির্ভরশীল না –

এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ নীতি সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। এ ধরনের প্রতিপক্ষে নিবৃত্ত করার মতো কোন চালই শত্রুর হাতে থাকে না। কারন এধরণের সংগঠন সিদ্ধান গ্রহনে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, এবং শুরু থেকেই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য হল শত্রুর সাথে সংঘাতে যাওয়া।

তাদেরকে কিভাবে আপনি তাদেরকে নিবৃত্ত করবেন যারা পুরো দুনিয়ার চাইতে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসে?

অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যূহের এ তিনটি স্তরকে ধ্বংস করার পাশপাশি আল-ক্বা'ইদাহ অ্যামেরিকাকে তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মনস্তাত্ত্বিক আঘাত করেছে। আল-ক্বা'ইদাহর এ হামলার সমপর্যায়ের আর কোন আঘাত অ্যামেরিকার মনোবল ও মনস্তত্ত্বের উপর আর কখনো আসে নি। পশ্চিমা সমরবিদদের মতে প্রতিপক্ষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরি কৌশলের অন্যতম হল তাকে এমন জায়গায় আঘাত করা যেখানে সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত বোধ করে। নিউইয়র্কের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল, কর্মব্যস্ত দিনে মুজাহিদিন ঠিক এ কাজটিই করেছেন।

সুতরাং কাপুরুষরা সামরিক শক্তির যে তারতম্যের কথা বলে জিহাদের দায়িত্ব থেকে দুড়ে পালাতে চায়, দেখা যাচ্ছে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে সেই শক্তির তারতম্যই হতে পারে পশ্চিমা সামরিক শক্তি, বিশেষ করে অ্যামেরিকারন সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর। 4G Warfare বা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ মুজাহিদিনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত,

অন্যদিকে অ্যামেরিকা তার সামরিক বাহিনীর আকার, তাদের সামরিক আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারনে চতউর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ কৌশলের সামনে প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল। কারন বর্তমানে আমরা এমন এক সময় পার করছি যখন প্রতিনিয়ত উম্মাহর যুবারা জিহাদমুখি হচ্ছে। উম্মাহ উপলব্ধি করছে লাঞ্ছনা ও অপমানের যে পর্যায়ে উম্মাহ পৌছেছে এর পর হারানোর আর কিছু বাকি থাকে না।

সময় এসেছে ক্রুসেডারদের সর্বাত্বক আক্রমনের মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনগুলোর চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলে নিজেদের পারদর্শী করে তোলার। সময় এসেছে উপযুক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতির মিশেল ঘটানোর। এজন্য প্রয়োজন দাওয়াতী কাজের সম্প্রসারনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে জনসমর্থন ও রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করা। এটি একটি শার'ঈ দায়িত্ব তো বটেই, পাশাপাশি এটি চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ। ক্লশউইটয এবং মাও যে তুং – এর মতো পূর্ব প্রজন্মের সমরকৌশলবিদদের রচনাতেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

অ্যামেরিকা চায় তার সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মুজাহিদিনের মনস্তাত্ত্বিক বিজয়কে মুছে দিতে। মুজাহিদিনের দুঃসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ আক্রমন মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে সহানুভূতি ও সমর্থনের মনোভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, অ্যামেরিকা চায় তা মুছে ফেলতে।

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন কাপুরুষদের কা কা রব বন্ধ করে দেন। তিনি যেন এ উম্মাহর মাঝে দায়ী ও উলামার এমন এক নতুন প্রজন্মের উত্থান ঘটান যারা হবেন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের দায়িত্বগ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহনে সক্ষম।

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল পরিকল্পণা ও তার বাস্তবায়ন

৯/১১ নিয়ে হামলাকে আল-ক্বা'ইদাহর সমর কৌশলের আলোকে বুঝতে হলে প্রথএম আমাদের বুঝতে হবে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আল-ক্বা'ইদাহর যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা কি ও কিভাবে আল-ক্বা'ইদাহ্* এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করছে।

অনেকেই ৯/১১ কে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা বা একটি দর্শনীয় হামলা হিসেবে বিবেচনা করতে চান। অনেকেই চান ৯/১১ এর পর আফগানিস্তানে অ্যামেরিকার আক্রমন ও ইমারাতে ইসলামিয়্যার পতনের মধ্যে ৯/১১ এর হামলার সফলতা ব্যার্থতার সমীকরন খুজতে। কিন্তু এধরণের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক না। কারন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চিত্রের প্রতি মনোযোগ দেয়ার বদলে চিত্রের ক্ষুদ্র একটি অংশে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

৯/১১ কে বুঝতে হলে, ৯/১১ যে যুদ্ধের অংশ সে যুদ্ধের মনোভাবকে বুঝতে হলে আগে আমাদের বুঝতে হবে ৯/১১ এর পূর্বে ক্রুসেডার ও যায়নিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মুসলিম উম্মাহর অবস্থা কি ছিল। আর বাস্তবতা হল উম্মাহ ছিল নিদ্রাচ্ছন্ন। উম্মাহর সামনে এক দীর্ঘ, দুরূহ, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যার মত শক্তির মোকাবেলা উম্মাহ এর আগে

করে নি। এমন এক শত্রু যে শুধু সামরিক, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতরই না বরং একইসাথে তারা এগিয়ে ছিল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দানে। মিডিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা ও দালাল বুদ্ধিজীবি ও আলিমদের মাধ্যমে এ শত্রু নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল মুসলিম উম্মাহর চিন্তার উপর। যুদ্ধে বিজয় তো দূরের কথা উম্মাহ বিজয়ের কথা চিন্তা করতেই ভুলে গিয়েছিল। যুদ্ধে যাওয়া তো দুরের কথা উম্মাহ যুদ্ধ হচ্ছে এটা সম্পর্কেই গাফেল ছিল। শত্রুর মোকাবেলা তো দূরের কথা উম্মাহ শত্রুকে চিনতেই পারছিল না। নিউ ওয়ার্ল্ড ওর্ডারের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে উম্মাহ নেশাগ্রস্থের মত টলতে টলতে ঘুরপাক খাচ্ছিল ব্যার্থতা, লাঞ্ছনা আর অপমানের গোলকধাঁধায়।

আল-ক্বা'ইদাহর সামনে ছিল বেশ কিছু অত্যন্ত জটিল সমস্যা।

প্রথমত, উম্মাহকে চেনানো তার প্রকৃত শত্রু কে।

দ্বিতীয়ত, উম্মাহ এ যুদ্ধের বাস্তবতা অনুধাবন করানো

তৃতীয়ত, শত্রু যে অজেয় না তা উম্মাহর সামনে তুলে ধরা

চতুর্থত, উম্মাহকে এ যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা। উম্মাহর জড়তাকে ভেঙ্গে দেওয়া

পঞ্চমত, অ্যামেরিকার বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রন নষ্ট করে দেওয়া

ষষ্ঠত, অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি খর্ব করা

সপ্তমত, উম্মাহর বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার গোপন যুদ্ধকে প্রকাশ্যে আনতে বাধ্য করা

অষ্টমত, এমন এক স্থানে অ্যমেরিকাকে যুদ্ধে আঁটকে ফেলা যেখানে কৌশলগতভাবে অ্যামেরিকা হবে দুর্বল

নবমত, উম্মাহর উপর জেঁকে বসা তাওয়াগিতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে যে প্রতিরোধ চলছিল তাকে একটি কেন্দ্রীয় রূপ দেওয়া

দশমত, মুসলিম বিশ্ব জুড়ে অ্যামেরিকার সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করা

আল-ক্বা'ইদাহ কোন রাষ্ট্র ছিল না, তাদের ছিল না বিশাল ফান্ড, লোকবল কিংবা অস্ত্রভাণ্ডার। সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এ সভ্যতার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা। আর এই যুদ্ধেরও অংশ ৯/১১।

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল পরিকল্পণা ও তার বাস্তবায়ন

অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হল একের পর এক আক্রমনের মাধ্যমে-

ক) অ্যামেরিকার "অজেয়" রূপ ধ্বংস করে দেওয়া,

খ) অ্যামেরিকাকে মুসলিম বিশ্বে সরাসরি যুদ্ধে টেনে আনা,

গ) অ্যামেরিকার অর্থিনীতিকে রক্তক্ষরণ করানো

ঘ) সারা বিশ্ব জুড়ে অ্যামেরিকান বাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংহতি (social cohesion) ধ্বংস করে দেওয়া।

এ উদ্দেশ্যসমূহ নিয়েই অ্যামেরিকার উপর দারুস সালাম, নাইরোবি, ও গাযওয়াতুল ম্যানহাটনের আক্রমন চালানো হয়।

এর ফলে অ্যামেরিকাকে দুটো ফাদে পা দিতে আকৃষ্ট করা হয়।

প্রথম ফাদটি হল অ্যামেরিকার ঔদ্ধত্য ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে ব্যবহার করে তাকে মুসলিম বিশ্বে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা। যেটা ছিল আফগানিস্তান আফগানিস্তানে অ্যামেরিকা এমন একটি যুদ্ধে আটকে আছে যেটা সে না গিলতে পারছে না ফেলতে পারছে। সে সম্পুর্ণ ভাবে সর্বাত্বক যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে না। কারন অ্যামেরিকার জেনারেল, নীতিনির্ধারকদের চিন্তাভাবনা, দর্শন ও আদর্শের একধরনের খাসী-করন। এরা যুদ্ধেজিততে চায়, কিন্তু যুদ্ধ রক্ত, ধ্বংস আর জীবন দিয়ে যুদ্ধ জয়ের মূল্য তারা দিতে চায় না। তারা চায় দ্রুত বিজয়। তারা চায় ময়দানে নেমে কাপড়ে ময়লা না লাগিয়েই জিতে যাবার। তাই তারা দালাল সেনাবাহিনী, নির্বিচার বিমান ও ড্রোন হামলা ও নিজেদের স্বল্প সংখ্যক সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে সিমিত পরিসরের যুদ্ধের মাধ্যমে এ যুদ্ধে বিজয়ী হতে চায়।

কিন্তু এ সীমিত পরিসরের যুদ্ধ দিয়ে (যেটা তারা বর্তমানে করছে, ড্রোন, কাফগানিস্তানে বেইস, দশ/বিশ হাজার সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে) তারা জিততে পারছে না।

অ্যামেরিকা নিজের জন্য পরিস্থিতি আরো খারাপ করেছে ইরাক আক্রমন করে ও সেখানে হেরে। এখন চাইলেও তারা সরাসসি ইরাক বা সিরিয়াতে ঢুকতে পারছে না। অর্থাৎ অ্যামেরিকার মূল ভূখন্ড অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে দূরে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার নীতির অক্ষমতা এক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। অথচ এক সময় মুসলিম উম্মাহ মনে করতো অ্যামেরিকা চাইলে পৃথিবীর যেকোন জায়গা দখল করে নিতে পারে, নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিতে পারে। আজো অনেকে এমন মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হল অ্যামেরিকার ক্ষমতার মায়াজাল আফগানিস্তান, ইরাক ও শামে ভেঙ্গে গেছে।

এ আগ্রাসনগূলোর কারনে অ্যামেরিকা প্রথমত বিশ্বব্যাপী জিহাদী তানযীমগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় ফাদটির জন্য আবশ্যক হল, অ্যামারিকাকে ও ইস্রাইলকে ক্রমাগত সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ভাবে আক্রমনের নিশানা বানানো। গাযাওয়াতুল ম্যানহাটনের অগ্রবর্তী দলের মতো হাজারটি দল যদি অ্যামেরিকাকে তার দেশের ভেতরে (আব্দুল হাকিম মুহাম্মাদ, ফোর্ট হুড, বস্টন, চ্যাটানুগা, স্যান বার্নাডিনো) এবং দেশের বাইরে (০২ তে করাচিতে অ্যামেরিকান কন্সুলেটে হামলা, রিয়াদ ও জেদ্দা বম্বিং, ০৮ এ ইয়েমেনে অ্যাম্বেসিতে হামলা, মুম্বাই অ্যাটাক, বেনগাজি) হামলার শিকার বানায় তবে অ্যামেরিকা কোন একটি দেশ পাবে না যাকে সে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারবে, আর না সে পারবে এক সাথে সবগুলো দেশে আক্রমন করতে।

বরং অ্যামেরিকা এই উপসংহারে আসবে যে এ শত্রু এক অশরীরী ন্যায় যে একই সাথে একাধিক স্থানে অবস্থান করে, কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে এ শত্রু ঘাটি গেড়ে বসে থাকে না, ফলে এসব দেশের সরকারগুলো তাকে নিরাপ্ততা দিতে সক্ষম না।

যখন অ্যামেরিকা অনুধাবন করবে মুসলিম বিশ্বের তাওয়াগীত শাসকগোষ্ঠী তাঁকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম না। তখন সে দুটো কাজের যেকোনে একটি করতে বাধ্য হবে।

১) হয় সে নিজে সরাসরি সামরিকভাবে ঐ সব দেশে প্রবেশ করবে

২) অথবা অ্যামেরিকা ঐসব দেশ থেকে তার স্বার্থ গুটিয়ে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করবে। এবং ঐসব দেশের এজেন্ট শাসকদের প্রতি তার স্মর্থন সরিয়ে নেবে, যেহেতু এখন এসব শাসকদের পক্ষ থেকে তার পাবার আর কিছু নেই।

যদি অ্যামেরিকা ১ নম্বর অপশন বেছে নেয়। তবে তার এ সিদ্ধান্ত এসব অঞ্চলে উপস্থিত তার সেনা ও তার কর্মকর্তাদের সাথে এসব দেশের জনগণের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেবে। যদি নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে অ্যামেরিকা কোন অঞ্চলে আসে। অর্থাৎ সামরিকভাবে কোন অঞ্চলে যদি অ্যামেরিকার আগমন ঘটে, তবে শুধুমাত্র অ্যামেরিকার উপস্থিতিই সে অঞ্চলের মুসলিম যুবকদের মধ্যে, তাদের রক্তে আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

হাজার হাজার মুসলিম যুবককে তখন আর কিছু বোঝাতে হবে না। তারা নিজের চোখেই দেখবে অ্যামেরিকা তাদের শত্রু, অ্যামেরিকা আগ্রাসনকারী। একই সাথে যদি অ্যামেরিকা

সামরিক ভাবে আগমন করে তবে তা মুজাহিদিনের সুবিধা ও অ্যামেরিকার অসুবিধাকে জ্যামিতি হারে বাড়িয়ে দেবে। কারন যে দশটি পয়েন্ট ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অ্যামেরিকার সামরিক উপস্থিতি প্রতিটির ক্ষেত্রেই মুজাহিদিনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, এবং প্রতিটির ক্ষেত্রেই অ্যামেরিকার জন্য সমস্যা বৃদ্ধি করবে।

আর যদি অ্যমেরিকা ২ নম্বর অপশন বেছে নেয় তবে মুজাহিদিনের মূল উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি অর্জিত হবে। যা হল মুসলিম বিশ্বের তাওয়াগিতের প্রতি অ্যামেরিকার সমর্থন ও মুসলিম বিশ্বে অ্যমেরিকার হস্তক্ষেপ।

4gw এবং বাংলাদেশ

ইতিহাস সাক্ষী সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। ইতিহাস এও সাক্ষী দেয় সঠিক সিদ্ধান্তকে ঘটনার পর সঠিক বলে চেনা যতোটা সহজ হলেও ঘটনা প্রবাহের সময় অধিকাংশের সময় ব্যাপারটা সহজ হয় না।

মুসলিম উম্মাহর জিহাদ আন্দোলনের মূল ফোকাস অ্যামেরিকাকে বানানো নিয়ে এবং বিশেষ ভাবে ৯/১১ হামলার ব্যাপারে আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বিরোধিতার সম্মূখিন হয়েছিলেন। এ বিরোধিতা শুধুমাত্র জিহাদী আন্দোলনের বাইরের মুসলিমদের দিক থেকে আসে নি। জিহাদী আন্দোলনের ভেতর থেকেও এ বিরোধিতা এসেছে। আঞ্চলিক জিহাদি সংগঠনগুলো শায়খ উসামা ও তানযীম ক্বা'ইদাতুল

জিহাদের এ নীতির বিরোধী ছিল, যদিও মুজাহিদ ভাই হিসেবে তাদের মধ্যে সখ্যতা ছিল। শায়খ আবু লাইস আল লিব্বী রাহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথীদের LIFG থেকে তানযীম ক্বা'ইদাতুল জিহাদে যোগ দেয়ার ঘটনা প্রবাহ থেকে এ ব্যাপারে LIFG এর মনোভাবের আভাস মেলে।

LIFG ছাড়া অন্যান্য অনেক আঞ্চলিক জিহাদি সংগঠনই শায়খের এ নীতির ব্যাপারে একমত ছিল না। খদ তানযীম ক্বা'ইদাতুল জিহাদের সদস্য এবং বলয়ের অনেকেই অ্যামেরিকাকে মূল লক্ষ্যবস্তু বানানোর নীতির বিরোধিতা না করলেও এ হামলার বিরোধিতা করেছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন শায়খ সাইফ আল আদল, শায়খ আবু হাফস আল মৌরিতানী, শায়খ আবু মুস'আব আস সুরি প্রমুখ। শায়খদের এ বিরোধিতার কারণও ছিল। কিন্তু ইতিহাস শায়খ উসামার সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমান করেছে। এবং যা ছিল পূর্বে একটি পরোক্ষ বাস্তবতা, সেই বৈশ্বিক জিহাদকে ৯/১১ প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় পরিণত করেছে। বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার-যায়নিস্ট-মুরতাদ শাসকঅক্ষ – তথা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের পরিকল্পনা মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দ করেছিলেন, ৯/১১ হামলা তাকে বাস্তব রূপ দান করেছে, এবং সফলতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। ইতিপূর্বে একটি কৌশলগত পর্যালোচনা" থ্রেডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। [http://bit.ly/1WkP8Mt]

একই সাথে ৯/১১ এর হামলা ও তার পরবর্তী প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে কার্যকরী ভাবে বিশ্ব কুফর শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুজাহিদিন 4GW কে যুদ্ধকৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। শায়খ আবু-'উবাইদা আল-ক্বুরাইশি রাহিমাহুল্লাহর আলোচনায় যা ফুটে উঠেছে। তবে দুঃখজনক ভাবে উম্মাহর বড় একটা অংশ এখনো হক্ব-বাতিলের এ যুদ্ধের ধরন সম্পর্কে পুরনো ধারণা আঁকড়ে আছে। আমরা এমন অনেক ভাইকদেরই দেখি যারা আল্লাহর ইচ্ছায় জিহাদের জাযবা ধারণ করেন কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলার ক্ষেত্রে তারা আধুনিক যুদ্ধের ধরন এবং কৌশল অনুধাবন করতে পারেন না। ঠিক কিভাবে তানযীম আল-ক্বা'ইদাহ এ যুদ্ধের ছক এঁকেছে এবং এ যুদ্ধ চালাচ্ছে তারা তা বুঝতে ব্যর্থ হন। এটা অনেক আলিমদের মাঝেও দেখা যায়, আর ছাত্র-শিবির/জামাত, হিযবুত তাহরীর ইত্যাদির ভাইদের মধ্যে তো দেখা যায়ই। যেকারনে – বোম ফুটিয়ে গোপনে মানুষ হত্যা করে কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে – বা এ জাতীয় বিভিন্ন কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই।

এধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় এ যুদ্ধের ধরণটা তারা বুঝতে পারেননি। কোন এক বিশাল ময়দানে দুটি বাহিনী মুখোমুখি হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে তারপর দিন শেষে বাহিনীদুটো নিজ নিজ ক্যাম্পে ফেরত যাবে এমন অবস্থা বর্তমানে নেই। আল মালহামাতুল ক্বুবরার আগে এর এমন অবস্থা হবে কি না – আল্লাহই ভালো জানেন।

তাই চতুর্থ প্রজন্মের এ যুদ্ধের ধরন সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন। আর এর জন্য আমাদের কিছু বাস্তবতাকে প্রথমে স্বীকার করে নিতে হবে –

১) লোকসংখ্যা, অর্থ, অস্ত্র, মিডিয়া – এ সকল ক্ষেত্রে মুজাহিদিন ও শত্রুর মাঝে শক্তির ভারসাম্যহীনতা আছে। এ প্রতিটি ক্ষেত্রে দাড়িপাল্লা শত্রুর দিকেই হেলে আছে।

২) ফিতনা এবং হত্যাকান্ড নিজ গায়ের উপর এসে যাবার আগে অধিকাংশ মানুষই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবে। তাওয়াগিত দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমদের ফিতরাতের মধ্যে যে বিকৃতি সাধনে সক্ষম হয়েছে এটা তার ফলাফল। যদি কেউ প্রমান চান তবে মিসর, লিবিয়া, কাশ্মীরের দিকে তাকাতে পারেন। এতো যুলুমের এসব অংশে মুসলিমদের বিশাল একটা অংশ আর মধ্যে আলিম-উলামাও শামিল আছেন – স্বৈরশাসন, গোত্রীয় শাসন এবং গণতন্ত্রের শাসনের মধ্যে দিয়ে – অর্থাৎ status quo/ বিদ্যমান বাস্তবতাকে জিইয়ে রেখে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন । বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হবে এমন মনে করার কোন কারন নেই। বিশেষ করে প্রকৃতিগত ভাবে বাংলাদেশীরা যখন উক্ত ভূমিগুলোর বাসিন্দাদের তুলনায় নরম প্রকৃতির।

৩। বাংলাদেশ মুজাহিদিনের জন্য একটি বদ্ধ খাচার মত। একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে মূল ঘাটি বানিয়ে (বা কোন অঞ্চলকে মুক্তাঙ্গন ঘোষণা করে) সেখানে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার মত স্থান ভৌগলিক ও জাতীয়-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটজনিত কারনে বাংলাদেশে নেই। একারনে যদি শুধু ৭১ এর সৃষ্ট সীমান্ত অনুযায়ী ভূখণ্ডের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে

মুজাহিদিনের জন্য এ ভূখন্ড একটি খাঁচার মতো। যেই ভাইরা কাজের সাথে যুক্ত আছেন তারা এখন এ সত্য বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছেন – আল্লাহ সকলে হেফাযত করুন, নিরাপত্তার চাঁদরে ঢেকে রাখুন।

৪। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি মোকাবেলায় লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি এ ভূখন্ডে এখনো তৈরি হয় নি, এবং এ মোকাবেলার কার্যকারন অনুধাবনের ক্ষমতা জনগনের নেই।

এসব বাস্তবতা অনুধাবনের পর যে জিনিসটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে ইনশা আল্লাহ, তা হল যে একমাত্র পদ্ধতিতে আল্লাহর ইচ্ছায় মুজাহিদিন কাজ করতে পারেন তা হল 4GW এর নীতি সমূহ নিজেদের কাজে এবং পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

শায়খ আবু উবাইদা আল-ক্বুরাইশি রাহিমাহুল্লাহর প্রবন্ধটির আলোকে উল্লিখিত চারটি বাস্তবতার দিকে তাকানো যাক।

"বিশেষজ্ঞদের মতে, চতুর্থ পর্যায়ের যুদ্ধ একটি নতুন ধরনের যুদ্ধ। এতে যুদ্ধ হবে মূলত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। শুধুমাত্র শত্রুর সামরিক স্থাপনা ও সেনাবাহিনীকে আঘাত করা মধ্যে এ যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং শত্রু দেশ বা জাতির সমাজও ও যুদ্ধের আওতায় পড়বে। এ যুদ্ধের একটি মূল লক্ষ্য হবে শত্রুর সেনাবাহিনীর বা যোদ্ধাদের প্রতি শত্রুর সমাজের যে সমর্থন তা নষ্ট করে দেওয়া। একারনে

এ যুদ্ধে দশ-বিশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার একটি ডিভিশানের চাইতে টিভি চ্যানেলগুলোর সংবাদ শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর কার্যকর অস্ত্র হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে।"

এখান থেকে মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। জিহাদি মিডীয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক লেখাই আছে, তবে এখনো পর্যন্ত এ মিডিয়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা আমরা সঠিক ভাবে অনুধারবন করতে পেরেছি বলে আমার মনে হয় না। জিহাদি মিডিয়ার একটি ভূমিকা মুজাহিদিনের খবর প্রচার করা। এর মাঝে আছে মুজাহিদিনের বক্তব্য, মানহাজ সক্রান্ত লেখা-বই-প্রবন্ধ, বিভিন্ন জিহাদি ময়দানের খবর ইত্যাদি। এ বিষয়টা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু জিহাদি মিডিয়ার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আর তা হল জনগনের চিন্তাকে পরিবর্তন করা। জনগনের চিন্তাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করা। জনগনের চিন্তাকে আকার দেওয়া।

আমরা যখন জিহাদি মানহাজের সবচেয়ে সফল দা'ঈ শায়খ আনওয়ার আল-আওলাকীর রাহিমাহুল্লাহ উদাহরনের দিকে তাকাই তখন আমরা দেখতে পাই শায়খের সর্বাধিক প্রচারিত এবং কার্যকর লেকচারগুলোর ৯০% সরাসরি জিহাদ নিয়ে না। যদিও এগুলোড় মধ্যে জিহাদের দিকে নির্দেশনা প্রোথিত। এমনকি শায়খের মনস্তাত্বিক যুদ্ধ, আল্লাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন, State of the Ummah এমননি Dust will Never Settle Down এর মতো লেকচারগুলোতেও সরাসরি ময়দানের কথা বলা হয় না।

অর্থাৎ মিডিয়ার কাজ শুধুমাত্র সরাসরি জিহাদের ময়দানের খবর কিংবা আল-ক্বা'ইদার বক্তব্য প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। বরং ওই চিন্তাধারার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করাও জরুরী যা মানুষকে ময়দানের দিক নির্দেশনা দেবে। জিহাদি মিডিয়ার কাজ যদি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তবে সাধারণ জনগনের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রভাব অর্জন করা হবে কঠিন। একারনে শুধুমাত্র খুরাসান, শাম, কিংবা সোমালের খবর প্রচার এ নিষ্ক্রিয় জনতাকে অনুপ্রানিত করার ক্ষেত্রে কটোতুকু ফলপ্রসু তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। একইভাবে চলমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মুজাহিদিনের দৃষ্টিভঙ্গি জনগনের সামনে তুলে ধরাটাও গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে জনগন মুজাহিদিনের চোখে বাস্তবতাকে দেখতে শেখে।

আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মূল দর্শক বা পাঠক কারা। কারন এর উপরই নির্ভর করবে আমাদের প্রচারনার, ধরন, বিষয়বস্তু ও ভাষা। সব শ্রেণীর দর্শকের জন্য একই ধাচের জিনিষ উপযুক্ত ন। যারা ইতিমধ্যে মানহাজ বুঝেছে তারাই কি আমাদের একমাত্র টার্গেট অডিয়েন্স? যাদেরকে সক্রিয়ভাবে কাজে শামিল করতে চাই তারাই কি আমাদের একমাত্র অডিয়েন্স? নাকি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মুজাহিদিনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় সমর্থনের দিকে নিয়ে আসাও আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত? বিশেষ করে আমাদের বৃহত্তর আলিম সমাজ যখন নিষ্ক্রিয়তার ও নিরবতার নীতি গ্রহণ করেছেন।

শায়খ আবু উবাইদ আল-ক্বুরাইশি লিখেছেন –

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের মূল কৌশলগত ফোকাস হবে শত্রুর মনস্তত্ত্বের উপর, এবং প্রতিপক্ষের সামরিক নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদদের চিন্তাকে প্রভাবিত করার উপর। শুধুমাত্র যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধবিন্যাস না চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকা পালন করবে মিডিয়া, এবং সকল ধরনের ইনফরমেশান নেটওয়ার্ক। এগুলোর উদ্দেশ্য হবে প্রতিপক্ষ দেশ বা জাতির সাধারণ জনগন ও অভিজাতশ্রেণীর চিন্তাকে, জনমতকে প্রভাবিত করা।

জনমতকে প্রভাবিত করার কাজে যদি আল্লাহর ইচ্ছায় সফলতা আসে তাহলে অধিকাংশ জনগন যদি নিষ্ক্রিয়ও থাকে তবু তারা নিষ্ক্রিয় সমর্থক হিসেবে থাকবে। যেমনটা শাতেমদের হত্যাকান্ডের সময় আমরা দেখেছি। কিন্তু জামাতুল বাগদাদির হঠকারী হামলার পর এ নিষ্ক্রিয় সমর্থন, বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে এবং অনেকে ক্ষেত্রে তা সক্রিয় বিরোধিতায় রূপ নিয়েছে। এবং এক্ষেত্রেও মিডিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে শত্রুর মিডিয়া জনগনের মধ্য সফল ভাবে ভয় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

শায়খ আবু উবাইদা আরো বলেন –

বিশেষজ্ঞরা আরো দাবি করলেন... একটা বিশাল ময়দানে বা কোন সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সামনাসামনি যুদ্ধের বদলে এ যুদ্ধ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হবে ভূতের মতো। যার আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ, আবার হঠাৎ করেই সে

মিলিয়ে যাবে। একি সময় একাধিক জায়গায় উদয় হবে আবার তাকে ধাওয়া করতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যাবে। এ যুদ্ধের ফোকাস হবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। এ যুদ্ধ হবে সর্বব্যাপী।

এটি 4GW এর একটি অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই দ্রুত গতির ফলেই শত্রুর বিশাল আকার ও ওজনকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। তুলনামূলক ভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষের জন্য শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবির্ভাব ও মিলিয়ে যাবার সক্ষমতা ছাড়া যদি আঘাত হানা হয় তবে শক্তিশালী শত্রু আপনাকে পিষে ফেলবে। অর্থাৎ সময়ের আগে সম্প্রসারনের নীতি জিহাদী আন্দোলনের জণ্য ক্ষতি বয়ে আনবে। প্রমান – বাংলাদেশে জামাতুল বাগদাদির বর্তমান অবস্থা।

জামাতুল বাগদাদি অতি দ্রুত তাদের আক্রমনকে এমন মাত্রায় উন্নীত করেছে যখন সরকার বাধ্য হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পূর্ণ ওজন নিয়ে তার উপর চেপে বসতে। আর জামাতুল বাগদাদী এ কাজটা করেছে প্রয়োজনীয় জনসমর্থন, ও নিজেদের সাংগঠনিক চেইনকে নিরাপদ করা ছাড়াই, এবং আবির্ভাব ও মিলিয়ে যাবার সক্ষমতা অর্জন ছাড়াই। সোজা বাংলায়, প্রস্তুতি ছাড়াই তারা এমন আক্রমন করেছে যারা ধাক্কা সামাল দেয়ার কোন উপযুক্ত পরিকল্পনাই তাদের ছিল না।

ইতিপূর্বে গুলশান হামলাঃ একটি পর্যালোচনা [http://bit.ly/2d5vb9u] – লেখাতে জামাতুল বাগদাদীর তিউনিশিয়া ও আলজেরিয়ার উদাহরণ উপস্থাপন করে আমি এ সম্ভাবনাটির কথা বলেছিলাম। এবং বাস্তবিকই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই ধরনের ফলাফলই এসেছে।

এই যে আবির্ভাব ও মিলীয়ে যাবার সক্ষমতা – এটা অনেকাংশেই নির্ভর করে মুজাহিদিনের প্রতি জনসমর্থন এবং নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির উপর। পক্ষান্তরে এ দুটো বিষয় নির্ভর করে মুজাহিদিনের দাওয়াতী কাজ তথা মিডিয়ার উপর। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট, ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং মুজাহিদিনের শক্তি ও সামর্থ্যের নির্মোহ বিশ্লেষনের পর বোঝা যায় এই তিনটি ক্ষেত্রে – জনসমর্থন, নেটওয়ার্ক ও মিডিয়া – বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার সফলতা এখনো অর্জিত হয় নি। আর বাংলাদেশের বাস্তবতার কারনে এ ফ্যাক্টরগুলোকে উপেক্ষা করাও সম্ভব না। যদি উপেক্ষা করা হয় তাহলে বাংলাদেশ মুজাহিদিনের জন্য খাঁচায় পরিনত হবে। যেমনটা জামাতুল বাগদাদীর কর্মকান্ডের ফলাফল হিসেবে আমরা দেখছি।

এ অবস্থায় কর্মসূচী এবং কর্মপন্থা নির্ধারনের সময়, এবং ব্যাক্তিগত ভাবে দাওয়াহ এবং কাজের সময় এ বিষয়গুলো বিবেচনা করা আবশ্যক। বিশেষ ভাবে, বিশেষ ভাবে মিডিয়ার দিকটি। সময় ও সক্ষমতা সম্পন্ন সকল ভাইয়ের উচিত এ কাজের ব্যাপারে ফিকির করা ও

সাধ্যমত কাজ করা। আর মুজাহিদিনের মিডিয়ার কাজ যেন শুধুমাত্র সরাসরি জিহাদের খবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে সেদিকেও আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

যুদ্ধ ক্রমপরিবর্তনশীল, যুদ্ধের নিয়মই এই যে দিনসমূহ আবর্তিত হতে থাকে। আর গতিশীল যুদ্ধে স্থবিরতা বিপর্যয় ডেকে আনে। তা কৌশলের দিক থেকে হোক কিংবা চিন্তার। আমাদের শত্রুকে টেক্কা দিতে হবে সাবরের দিক দিয়ে এবং কৌশলের দিক দিয়ে। শায়খ উসামা উম্মাহর জিহাদ আন্দোলনের বৈশ্বিক পূনর্জাগরন সঠিক নির্দেশনা দানে সক্ষম হয়েছিলেন কারন আল্লাহর ইচ্ছায় সঠিক সময়ে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ যেন এ ভূমির মুজাহিদিনকে সে তাউফীক দান করেন। আমীন ।